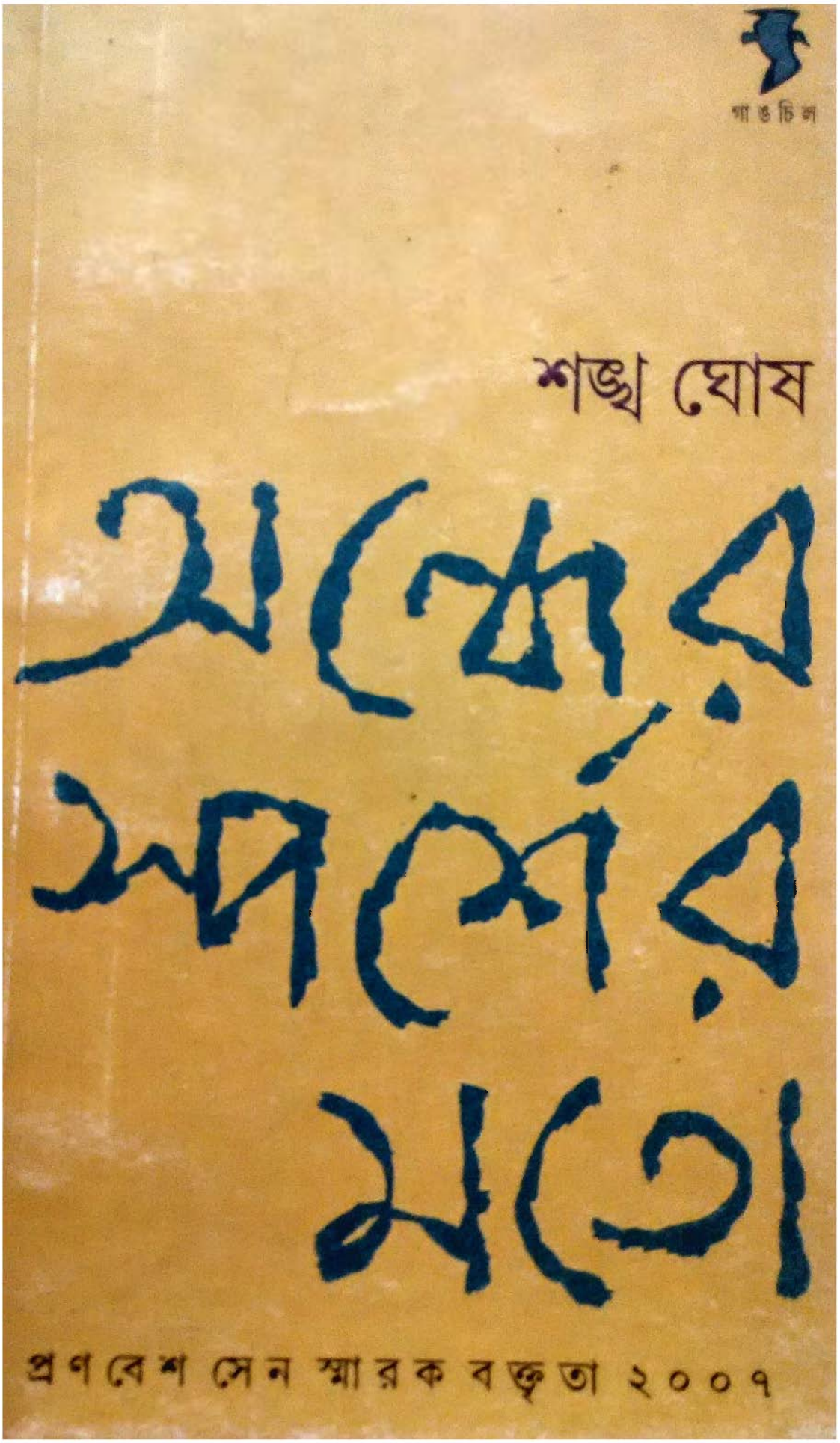

গাঙচিল

শঙ্খ ঘোষ

অন্ধের স্পর্শের মতো

প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা ২০০৭

অন্ধের স্পর্শের মতো

রাহুল বিদ
ইন্দিরাপল্লি
০৯।০৬।০৯

প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা ২০০৭

অন্ধের স্পর্শের মতো

শঙ্খ ঘোষ

গাঙচিল

প্র স ঙ্গ ত

তর সইছিল না অনেকের। সেদিন সভাশেষে গুঞ্জন ওঠে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেরি না করে বক্তার এই কথা আরো মানুষের কাছে পৌঁছনো দরকার। ভাষণ শোনার পর মুগ্ধতায় অনেকেই তাঁদের খুশির কথা জানাতে ছুটেও আসেন বক্তার কাছে। তাঁকে ঘিরে কেউ কেউ বলতেও থাকেন: ভাষণটি এখনই প্রকাশ করা চাই, আমরা সবরকম সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। তখনই আবার ভেবেছি, কিছু সময় পেরিয়ে গেলে হয়তো শ্রোতাদের মুগ্ধতার এই ঘোর কেটে যাবে। কিন্তু না, উৎসাহ বেড়ে গেল আরো। টেলিফোনে আরো অনেকেরই অনুরোধ পেতে থাকলাম আমরা। যাঁরা সেদিন (৩ এপ্রিল ২০০৭) কলকাতার শিশিরমঞ্চে ষষ্ঠ প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি, বন্ধু ও প্রিয়জনদের কাছে শঙ্খ ঘোষের ভাষণের মর্মার্থ শুনে তাঁরাও আর্জি জানালেন, এই ভাষণ পুস্তিকার আকারে অবিলম্বে প্রকাশ করার। একই অনুরোধ আসতে থাকল বক্তার কাছেও।

Pranabesh Sen Memorial Lecture 2007

Andher sparsher mato

by Sankha Ghosh

© প্রণবেশ সেন স্মারক সমিতি

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ ১৪১৪ মে ২০০৭

প্রকাশক

অণিমা বিশ্বাস

গাঙচিল

'মাটির বাড়ি', ওঙ্কারপার্ক, ঘোলাবাজার

কলকাতা ৭০০ ১১১

যোগাযোগ (০৩৩) ২৫৫৩ ৮৫০২

ই-মেল doyelnet@vsnl.net

পরিবেশক ও বিক্রয় কেন্দ্র

দোয়েল

৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফবিন্যাস

গঙ্গা মুদ্রণ ৫৪/১বি শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক

জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদপট

কৃষ্ণেন্দু চাকী

দাম ২০ টাকা

তখনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হল, পরবর্তী স্মারক বক্তৃতা পর্যন্ত আর অপেক্ষা নয়, সমিতির প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়েই আমরা প্রকাশ করব কবির এই অভিভাষণ।

২০০০ সালের ৯ ডিসেম্বর বেতার সাংবাদিক প্রণবেশ সেনের প্রয়াণের পর ২০০২ থেকে আমরা নিয়মিত এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করছি। শুরু থেকেই আমরা মনেপ্রাণে চাইছিলাম শঙ্খ ঘোষ এই স্মরণসভায় একবার বক্তা হিসেবে আসুন। সফল হচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু কোনো একদিন সফল হতে পারি, এই প্রতীক্ষার স্বাধীনতাটুকুও খোয়াতে চাইনি।

প্রণবেশ সেনের *সংবাদ পরিক্রমা* ও তাঁর স্মৃতিতে নিবেদিত রচনাগুলি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের সময় তিনি অকৃপণভাবে সাহায্য করেছিলেন আমাদের। বইটির নামকরণও *(সম্প্রচারের ভাষা/প্রণবেশ সেনের স্মৃতিতে)* তাঁর। এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশও তাঁর হাত দিয়েই। শঙ্খ ঘোষ আমাদের বার বার বলেছেন: প্রণবেশবাবুর লেখা যত বেশি প্রকাশ করা যায়, ততই তো ভালো। এমন উৎসাহ আমরা যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, প্রণবেশ সেনের স্মরণসভায় তাঁকে বক্তা হিসেবে পেতে চাইব না?

ভাষণের নির্দিষ্ট কোনো শিরোনাম নয়, বক্তা ঠিক কী বিষয়ে বলতে পারেন, তার ক্ষীণ আভাস মিলেছিল স্মরণসভার ঠিক দু-দিন আগে। জানতে পারি *সংযোগের ভাষা* নিয়েই হয়তো তাঁর ভাষণে নানা অভিমুখে যেতে চাইবেন, এমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ। প্রণবেশ সেনের মতো একজন

বেতার সাংবাদিকের স্মরণসভায় এর চাইতে যথার্থ বিষয় আর কী হতে পারে।

সেদিনের ভাষণে অন্ধের স্পর্শের মতোই তাঁর কথা শ্রোতাদের একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। 'ভালো করে কথা ভাবা এখন কঠিন' হলেও তিনি যেভাবে তাঁর ভাবনার আলোকে ভাষণটি শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন, তা এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। তাই হয়তো দেরি না করে এই পুস্তিকা প্রকাশের দাবি উঠেছিল সেদিন।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের ৮০ বছর পূর্তি সমাগত। বক্তা শঙ্খ ঘোষও তাঁর চিন্তায় চেতনায় আমাদের সমৃদ্ধ করতে করতে জীবনের ৭৫ বছর পেরিয়ে এলেন। এমন একটা যোগাযোগের লগ্নে কবির এই অভিভাষণ আমাদের কাছে অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আগ্রহী সকলের দাবি মেটাতে প্রণবেশ সেন স্মারক সমিতির হয়ে ভাষণটি পুস্তিকার আকারে সাগ্রহে প্রকাশ করছে *গাঙচিল*। তাদের যত্নশীল উপস্থাপনায়, এই স্মরণীয় অভিভাষণটির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পুস্তিকাটি প্রকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য প্রণবেশ সেনের পুত্র ইন্দ্রনীল সেন ও পরিবারের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ভবেশ দাশ
সংযুক্তা সিংহ
প্রণবেশ সেন স্মারক সমিতির পক্ষে

১ বৈশাখ ১৪১৪
১৫ এপ্রিল ২০০৭

অভ্যাগত সবাইকে আমার নমস্কার জানাই। প্রণবেশ সেনের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাই।

এখানে যে বলা হলো, এ বছরের স্মারক বক্তৃতা দিতে আমি রাজি হয়েছি, তা ঠিক। কিন্তু সাত দিন আগে পর্যন্তও চেষ্টা করেছিলাম যে, যদি কোনোরকমে এটা বন্ধ করে দেওয়া যায়।

এগুলো আমি এমনিতেই পারি না। আর তাছাড়া, এই সময়টা! এমন একটা সময়ে এসে পৌঁছেছি আমরা— জীবনানন্দের কবিতার লাইন মনে পড়ে, 'ভালো করে কথা ভাবা এখন কঠিন'!

কিন্তু বলতে তবু হবে। তার কারণ ইতিমধ্যেই আমার শেষ মিনতি জানাবার আগেই ছাপা চিঠি নানা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ভবেশ।

তাঁকে তখন জানাতেও পারিনি যে কী বিষয়ে বলব। এখন যেটা বলা হলো ['সংযোগের ভাষা'] দিনতিনেক আগে কাউকে বলেছি এ-রকম একটা নাম। নাম না, বিষয়। ঘণ্টাখানেক আগে আমার এক বন্ধু জিজ্ঞেস করছিলেন, কী বিষয়ে বলব। লিখে এনেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে যে বিষয়টা বলতে পেরেছি, তা নয়। একথাগুলো বলে নিচ্ছি এইজন্যে যে একটু এলোমেলো কথা হয়তো থাকবে, লিখে আনা সত্ত্বেও।

ভবেশ আরো আমাকে বলেছেন যে, এক ঘণ্টা বলতে হবে। সেটা আমার পক্ষে একটু শক্ত হলেও ওটা নিয়ে ভাবছি না, ভাবছি আপনাদের কথা। এই সময়টা আপনাদের একটু সহ্য করতে হবে।

এই লেখার প্রথম দিকের কয়েকটা লাইন, পাঁচ-ছটা লাইন, ছেড়ে দিলে, এর আছে পাঁচটা অংশ। অংশগুলি আপনারা বুঝতে পারবেন, সেটা আমি বলে দেব। লেখার একটা নাম আছে। নাম: *অন্ধের স্পর্শের মতো।*

জীবনের শেষ কয়েকটা বছর চোখে দেখতে পেতেন না আমার বাবা। বই পড়তে ভালোবাসতেন, কিন্তু পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ভালোবাসতেন কথা বলতে। কিন্তু কথাও কিছুটা থমকে গেল। অভ্যাগতেরা কেউ দরজায় এসে দাঁড়ালে চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করতেন: 'কে?' নাম শুনে 'কই, হাতটা দেখি' বলে বাড়িয়ে দিতেন হাত। তারপর সেই অভ্যাগতের হাত ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকতেন চুপ করে। কথা কখনো হ'তো, কখনো হতো না। কিন্তু হাতের ওই জড়িয়ে-থাকাটুকু ছিলই।

—

১

কারো সঙ্গে যখন আমরা কথা বলি, আমরা চাই যে সেই কথাটা সে বুঝুক; আমার ভাবনাটা বা দৃষ্টিভঙ্গিটা তার কাছে গিয়ে পৌঁছক। এইরকমই হবার কথা। কিন্তু

সবসময়েই কি সে-রকম চাই আমরা? বা, প্রশ্নটাকে অন্যভাবেও সাজানো যায়: জ্ঞাতসারে তেমনটা চাইলেও, অজ্ঞাতেও কি সেইরকমই চাই সবসময়ে? সে বুঝুক, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এটা অবশ্য চাই। কিন্তু কী বুঝুক? আমার কথাটা? ভাবনাটা? না কি অনেকসময়ে এইটে: আমি-যে ভাবতে পারি, সেই ক্ষমতাটা? কিংবা অনেকসময়ে, তারও চেয়ে একটু এগিয়ে, ভাবতে পারি বা না পারি, আমি যে আমি, সেই অবস্থানটা? কথা বলা একটা সংযোগ। কিন্তু ওইসব সময়ে, ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয়— কেবলমাত্র অ-যোগ নয়— সেটা সমূহ বি-যোগেও গিয়ে পৌঁছতে পারে।

এসব নিয়ে অল্পসময়ের জন্য একটু ভাবতে হয়েছিল একবার, প্রায় চল্লিশ বছর আগে, আকাশবাণী-গত একটা অভিজ্ঞতার ফলে। সেখান থেকে একটা ডাক এসেছিল অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের আর আমার, বলবার মতো একটা কাজ পাওয়া গিয়েছিল কয়েক সপ্তাহের জন্য। সন্ধেবেলায়, সংবাদ আর স্থানীয় সংবাদের মধ্যবর্তী পাঁচ মিনিটের বিরতিপর্বে, একটা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা হয়েছিল 'সমীক্ষা' নামে। সেই সমীক্ষায় আমাদের উপর দায়িত্ব বর্তেছিল সাহিত্যসংস্কৃতি নিয়ে কিছু বলবার। সংবাদ-স্থানীয়সংবাদের মাঝখানে মাত্র

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাহিত্যের কোনো প্রসঙ্গে কী করে কথা বলব, কী কথাই-বা বলব, অল্পবয়সের উত্তেজনায় সেসব দুরূহ সমস্যা নিয়ে কিছু ভাবিইনি আমরা। সাগ্রহেই, সপ্তাহে একদিন করে, বলেছিলাম কিছু কথা।

কিন্তু শ্রোতাদের কেমন লাগছিল সেটা? নিকটবন্ধুদের প্রশ্রয়ে আমরা অবশ্য তৃপ্তই ছিলাম, কিন্তু সে-তৃপ্তিতে ধ্বস নামল একদিন। অলোকরঞ্জনের মা, আমাদের মাসিমা, দুঃখের স্বরে একদিন বললেন আমাকে: 'অলোক বলে শক্ত শক্ত শব্দ আর তুমি সহজ সহজ, কিন্তু তোমাদের কারো কথাই যে বুঝতে পারে না কেউ!' চমক লাগল শুনে। বুঝতে পারে না? তাহলে বলছি কেন? এ-প্রশ্নের পরেই মনে হলো: কারা বুঝতে পারে না? মাসিমার কাছে কারা এই অভিযোগ জানিয়েছে? খেয়াল হলো তখন: সংবাদ আর স্থানীয় সংবাদ শোনেন যে অসংখ্য মানুষজন, সাহিত্য-বিষয়ে যাঁদের মধ্যে অনেকেরই কোনো স্বতন্ত্র আকাঙ্ক্ষা বা অধিকার নেই, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা জাগাবার মতো কোনো ভাষা বা রীতি কি আমরা ব্যবহার করতে পারছি? সাহিত্য-বিষয়ে অভিজ্ঞ যাঁরা এবং সে-বিষয়ে যাঁরা অনভিজ্ঞ, একইসঙ্গে এই দু-রকমের শ্রোতার কাছে পৌঁছবার কোনো পথের কথা কি আমরা ভেবে

নিয়েছি? অর্থাৎ এ-লেখার সূচনায় যে-প্রশ্নগুলি তুলেছিলাম, তার সঙ্গে এখানে জুড়ে যায় আরো কিছু প্রশ্ন: ভেবেছি কি কার সঙ্গে কথা বলছি আমরা, বা কাদের সঙ্গে? কথাটা পৌঁছে দিতে চাইছি ঠিক কাদের কাছে?

না, শুধু এইটুকুই নয়, প্রশ্ন ওঠে আরো। শ্রোতাচরিত্রের কথা ছেড়ে দিলেও, যিনি বলছেন, তাঁর অবস্থানটা ঠিক কী? তিনি কি সামনাসামনি একজনের সঙ্গে কথা বলছেন? তিনি কি সামনাসামনি অনেকের সঙ্গে কথা বলছেন? তিনি কি মঞ্চগত দূরত্ব থেকে বলছেন? কিংবা, শ্রোতা বা দর্শক যেখানে অদৃশ্য, সেই দূরদর্শনে বলছেন নিজে দৃশ্যমান থেকে? না কি *রাজা* নাটকের রাজার মতো স্বরমাত্র হয়ে ভেসে থাকছেন আকাশবাণীতে? এর প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রোতা আর বক্তার সম্পর্কের মধ্যে একটা বদল ঘটে যায়, আর সেই অনুযায়ী স্থির করে নিতে হয় ভাষা। এমনকী, কখনো কখনো হয়তো, সেই অনুযায়ী স্থির করে নিতে হয় বিষয়ও। এসব কথা সেদিন আমরা— অন্তত আমি— ভেবে নিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। অত্যুৎসাহে আমরা কেবল আমাদের জানা-বোঝাটাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম সেইভাবে, যেভাবে আমরা লিখি,

যে-লেখার সামনে কোনো শ্রোতা নেই, আছে পাঠক। পাঠকের জন্য উদ্দিষ্ট লেখা শ্রোতারও কাছে পৌঁছবে কীভাবে, সেটা তেমন করে ভাবিনি বলেই মাসিমাকে সকাতরে বলতে হয়: তোমাদের কারো কথাই যে বুঝতে পারে না কেউ!

ধরা যাক আমি কথা বলছি কবিতা আর সমসময়ের সম্পর্ক নিয়ে। কোনো আনুমানিক ব্যাপার নয় এটা, একদিনের সমীক্ষার বিষয় হিসেবে এটাই ছিল একবার আমার নির্বাচন। পাঁচ মিনিটের অবকাশে সেদিনকার কথিকায় শেষ অনুচ্ছেদটি এবং তার পূর্ববর্তী একটি বাক্য ছিল এইরকম:

> কেবল ঐতিহ্য নয়, তখন তিনি [কবি] চান প্রবহমান বিশ্বকালকে তাঁর মধ্যে বহন করতে, আর এ-দুয়ের নিরন্তর সংঘর্ষ থেকে দেখা দিতে থাকে আজকের দিনের আধুনিকতা।
>
> এইটেই মনে ছিল, যখন জীবনানন্দ বলেছিলেন, কবিতার অস্থি-র মধ্যে চাই ইতিহাস-চেতনা আর তার মর্মে চাই পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। এই জ্ঞানেই উজ্জয়িনীর সময় মিশে যায় মিশর বা গ্রীসের সঙ্গে, এই চেতনাতেই একনিশ্বাসে বাঁধা পড়ে উর্বশী আর আর্টেমিস। কিন্তু কবি কখনোই ভুলে যান না যে এক হাতে এই দেশনিহিত কাল আর অন্য হাতে

> দেশোত্তর কাল ধারণ করবার মুহূর্তেও তিনি পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন অস্থির সমসময়ের সংকটের ওপর। সময়ের এই জটিল প্রত্যাঘাতই কবিতাকে এক মুহূর্ত থেকে আরেক মুহূর্তে সঞ্চারিত করে নেয়।

কথাগুলি লিখবার সময়ে সেদিন নিশ্চয় মনেই রাখিনি যে এটা যাঁরা শুনছেন তাঁদের অনেকেরই কাছে এর কয়েকটি শব্দ প্রায় ধাঁধার মতো লাগবে, কেননা তাঁরা অনেকেই আধুনিক কবিতার জগৎটাকে ঠিকমতো জানেন না। তাই উজ্জয়িনীর সঙ্গে মিশর বা উর্বশীর সঙ্গে আর্টেমিস একসঙ্গে বাঁধা পড়বার কথা কেন এখানে উঠে এল হঠাৎ, জীবনানন্দ বা বিষ্ণু দে-র কবিতা নিয়ে সামান্য একটু বিস্তারে না বললে অনেকেরই কাছে পৌঁছবে না এর কোনো তাৎপর্য। ফলে গোটা অনুচ্ছেদটাই সেই শ্রোতার কাছে থেকে যাবে অনধিগম্য, প্রায় অর্থহীন। কথাগুলি যদি কেউ পড়েন, তাহলে হয়তো-বা তিনি সময় পেতে পারেন বুঝে নেবার, বিশ্লেষণ করে নেবার, কিন্তু সেই সময়টা তো শ্রোতার আয়ত্তে নেই। আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে অলক্ষ্য এবং অসংখ্য সেইসব শ্রোতার জন্য চাই ভিন্ন একটা ভাষা। ব্যক্তিগত জানার অভিমানে সেকথাটা সর্বতোভাবে আমরা ভাবিনি সেদিন।

কিন্তু আরো একটা প্রশ্ন আছে এখানে, মাসিমা যখন দুঃখটা জানিয়েছিলেন, তখন কি পুরোপুরি ব্যর্থতারই বোধ জেগেছিল মনে? না কি সেইসঙ্গে গোপন একটা অহমিকাও লালিত হচ্ছিল সেখানে? এই অহমিকা, যে, আমি এমন-কিছু বলছি যা অন্যের আয়ত্তের বাইরে। অর্থাৎ, এইখানে আমি পৃথক, এইখানে আমি খানিকটা উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। আর, সেই পৃথক অধিষ্ঠানকে সম্ভ্রম করছে অন্য লোকে। না-বুঝবার সম্ভ্রম। আমার বুঝবার বা জানবার ক্ষমতার প্রতি অন্যের অক্ষমতার সম্ভ্রম। আর এইটেকেই আমি আমার স্বতন্ত্রতা বলে ভাবছি, ভেবে তৃপ্ত হচ্ছি।

কিছুদিন আগেকার একটি সংলাপে নোঅম চম্স্কি একবার বলেছিলেন, কারো কাছে চার সিলেব্লের কোনো শব্দ শুনলেও তিনি বুঝে নিতে চান ওটা এক সিলেব্লে বলা সম্ভব ছিল কি না। বলেছিলেন যে, বক্তা অনেকসময়ে ভাবেন তাঁর সব কথা যদি বুঝেই ফেলল সবাই তাহলে তিনি আর বিশিষ্ট কিসে? অনেক চেষ্টায় অনেক কষ্টে একটা জিনিস বুঝতে হয়েছে তাঁকে, অধিগত করতে হয়েছে, আর অন্যেরা সেটা বুঝতে পারছে না, 'and then that becomes the basis for

your privilege and your power'। আমরাও কি সেইদিকেই চলে যাচ্ছিলাম? কিংবা, যাচ্ছি আজও?

অনেকেই যে যাচ্ছি, তাতে সন্দেহ নেই। মনীষার নিয়মিত প্রকাশ থাকে, এই শহরেরই এমন একটি পত্রিকায় তার দু-একটি লেখা বুঝতে না পেরে যখন নিজের বোধবুদ্ধির সীমা ভেবে অবসন্ন হয়ে পড়ছি, তখন একদিন হঠাৎ তার ধীসম্পন্ন অভিজ্ঞ সম্পাদকের একটি মন্তব্য পাওয়া গেল। তিনি বিলাপ করছিলেন এই বলে যে সম্প্রতি এমন লেখাও তাঁকে ছাপতে হচ্ছে যার সবটা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। তখন নিশ্চয় এই প্রশ্ন ওঠে, ওঠা উচিত, যে, তাঁর মতো ধীমানও যদি বুঝতে না পারেন তাহলে সেটা পৌঁছচ্ছে কোথায়? কোন্ দু-চারজনের বৃত্তে আবদ্ধ থেকে আবর্তিত হচ্ছে সেটা? এ-সমস্যাটা যে কেবল এই শহরের তা নয়, পৃথিবীজোড়া এই সমস্যা। চম্স্কির যে সংলাপের কথা একটু আগেই ছিল, বিশ্বগত এই দুর্লক্ষণটার কথা সেখানে তিনি তুলেছিলেন এইভাবে:

> ...it's not necessarily a criticism to say that something doesn't make sense: there are subjects that it's hard to talk sensibly about. But if I read, say, Russell, or analytic philosophy, or Wittgenstein and so on, I

> think I can come to understand what they're saying, and I can see why I think it's wrong, as I often do. But when I read, you know, Derrida, or Lacan, or Althusser, or any of these– I just don't understand it. It's like words passing in front of my eyes: I can't follow the arguments, I don't see the arguments, anything that looks like a description of a fact looks wrong to me. So may be I'm missing a gene or something, its possible. But my honest opinion is, I think it's all fraud.

চম্স্কির এই শেষ লাইনটির সঙ্গে আমরা অনেকেই নিশ্চয় একমত হব না, এমনকী তিনিও হয়তো এতটা বলে বসেছেন কোনো সাময়িক উত্তেজনাবশে।[১] কিন্তু এখান থেকে উঠে আসা এই প্রশ্নটা তবু জরুরি যে কীভাবে, কতটা সহজে, কোনো ভাবনাকে আমরা পৌঁছে দিতে পারি শ্রোতার কাছে, বা পাঠকের কাছে।

---

১ এ-প্রসঙ্গে একটু সতর্কীকরণ দরকার। বিশ্ববিদিত যে-মনীষীদের নাম এখানে বলা হলো, তাঁদের চিন্তাজগৎ বিষয়ে কোনো অনাস্থাজ্ঞাপন কিন্তু এ-উল্লেখের লক্ষ্য নয়। কিংবা, কথাটা এও নয় যে দুরূহতা মাত্রেই সন্দেহযোগ্য। বিষয়ের মাত্রা অনুযায়ী বোধ্যতার মাত্রা পালটায়, শ্রোতা বা পাঠকেরও নিজেকে কিছুটা তৈরি করে নেওয়া দরকার হয়। অন্যপক্ষে, এও বোঝা চাই যে সরলতা মাত্রেই তরলতা নয়।

এটা বুঝে নেওয়া খুব জরুরি যে আমরা কী চাই। আমরা-যে জানি, সেই খবরটাই কি জানাতে চাই? না কি আমরা যা বুঝি, সেই বোঝাটাকে বোঝাতে চাই? দ্বিতীয়টাই হবার কথা, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেকসময়েই ঘটে ওঠে না সেটা।

২

আমাদের কৈশোর বা যৌবনে যেসব মাস্টারমশাইয়ের কাছে আমরা পড়েছি, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকেই মনে হয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য। তাঁদের মধ্যে বিশেষ একজনের কথা প্রায় প্রতিদিনই মনে পড়ে: তিনি গোপীনাথ ভট্টাচার্য। প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। চালচলনে কথায়বার্তায় ছিল স্থির একটা সমাহিত ভাব। ধীর পায়ে ক্লাসে এসে, নাম ডাকবার পর খাতাখানা বন্ধ করে, টেবিলের ওপর চক দিয়ে আলতো করে লিখতেন দু-একটা কথা, লিখে মুছে দিতেন, তারপর তাকাতেন আমাদের দিকে, শুরু করতেন পড়ানো। মধ্যবর্তী ওই নিঃশব্দ সময়টায়, আমরা বুঝতে পারতাম, আত্মস্থ হয়ে নিচ্ছেন তিনি, নিজেকে অভিমুখী করে তুলছেন বিশেষ এই ক্লাসটির জন্য।

কেমন ছিল তাঁর পড়াবার ধরণ? খুব শান্ত আর নীচু গলায় কথা বলে যেতেন তিনি। সে-বলার মধ্যে কোনো বাগ্মিতা থাকত না, কিন্তু একটা জোর থাকত, প্রবাহ থাকত, আর থাকত সরল একটা কথোপকথনের ভঙ্গি।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন একদিন। খাতায় নোট নিচ্ছিল যে ছেলেমেয়েরা, একটু অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকিয়েছিল তারা। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাদের দিকে চোখ রেখে স্মিতভাবে বলেছিলেন তিনি: 'তাহলে আমি কথা বলব কার সঙ্গে? বোঝাব কাকে যদি তোমাদের চোখ থাকে খাতায়? বুঝব কেমন করে যে কথাগুলি পৌঁছচ্ছে কোথাও? বিষয়টা তো তোমাদের আমি বোঝাতেই চাইছি? বুঝে নাও যদি, মাথা ঝুঁকিয়ে নোট নেবার তো আর দরকারই হয় না তবে।'

ছেলেমেয়েরা কতটা মানত তাঁর এই নির্দেশ, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু ওই-যে তিনি সকলের চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলতে চাইতেন, তার মধ্যে ছিল একটা সহজ সংযোগের ব্যাকুলতা। শুকনো ক্লাসপড়ানো নয় যেন সেটা, সে যেন কোনো-একটা সঞ্চারের সময়। আর এই সঞ্চারটা তিনি ঘটাতে চাইতেন একটা মৃদুতার মধ্য দিয়ে, একটা নিরুত্তেজ শান্ত স্বরের মধ্য দিয়ে। কথা বলবার মতো করে।

এখানে ওই মাত্রাবোধের সূত্রে। 'তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে' সেই মাস্টারমশাই তাঁর ছাত্রের জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর নিজের জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। যিনি 'না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে', যিনি তাঁর 'অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন, সেইজন্যে আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না', *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের সেই চন্দ্রনাথবাবু তাঁর স্বাভাবিক স্থৈর্যের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন ছাত্র নিখিলেশের দৈনন্দিনে। চন্দ্রনাথবাবু ছিলেন, 'তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি'— বলেছিল নিখিলেশ। শান্তিনিকেতন-ভাষণের ওই 'একটু চুপ করো, একটু স্থির হও' কথাকটিই যেন বারে বারে রূপায়িত হতে থাকে চন্দ্রনাথবাবুরও কথায় বা নিখিলেশের আচরণে। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার পক্ষে যখন চড়া ভাষায় সওয়াল করে সন্দীপ, তখন চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বলেন: 'ছটফট করতে চান করুন, কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিংবা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছটফট করে নি, তার কাজ করেছে।'

এতটা যে তাঁকে মনে পড়ে সে কেবল এজন্য নয় যে পঠিতব্য বিষয়টাকে খুব ভালোমতো বোঝাতে পারতেন তিনি। মনে পড়ে এইজন্য যে তাঁর ওই ব্যক্তিত্বের মধ্যে, ব্যক্তিত্বপ্রকাশের প্রকরণের মধ্যে, শান্ত স্থির একটা প্রত্যয়ের বিচ্ছুরণ হতো। বলা যায়, তাঁর ভিতরকার প্রত্যয়টাই— সে-প্রত্যয়ের শক্তিটাই— এতটা শান্ত রাখতে পারত তাঁকে। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-ভাষণমালার এক জায়গায় আছে: 'আমরা সমস্ত দিন কতরকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই— কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, এই যে-জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে ব'লো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চ'লো না।' সেখানে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: 'সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়, তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে।' আমাদের ওই মাস্টারমশাইয়ের কাছে সবচেয়ে বড়ো শিক্ষণীয় যা ছিল, তা এই মাত্রাবোধ। স্বরের, বাচনের, এবং নীরবতার মাত্রা।

জীবন থেকে নেওয়া নয়, সাহিত্য থেকে নেওয়া ভিন্ন আরেক মাস্টারমশাইয়েরও কথা মনে পড়ে

দেশবোধের বা দেশের কাজের এই ভিন্ন দুটো পথের প্রতিস্পর্ধিতা নিয়ে *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস: এই ছটফট করা আর কাজ করা। বা, বলা যায়, ছটফট করে কাজ করা আর স্থিরভাবে কাজ করা। সন্দীপ আর নিখিলেশ। আপাতশক্তি আর নিহিতশক্তি। আপাতশক্তির আস্ফালনে সন্দীপ দ্রুত একটা সংযোগ তৈরি করতে পারবে বলে ভাবে, প্রভাবিত করতে পারবে, সে-প্রভাবের দ্রুত ফল দেখতে পাবে। আর নিহিতশক্তির সঞ্চারে নিখিলেশ চায় কিছু গড়ে তুলতে, যদিও সে জানে যে এ-সংযোগের কোনো ফল হাতেহাতে মেলে না, এর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয় অনেকদিন পর্যন্ত।

এই অপেক্ষা করে থাকাকে কারো মনে হতে পারে সংকল্পের অভাব বা পৌরুষের অভাব— নিখিলেশের হালচাল দেখে বিমলার যেমন মনে হয়েছিল। মনে হতে পারে যে বার্তাটা কোথাও পৌঁছচ্ছে না, কারো সঙ্গেই সংযোগ ঘটছে না কোথাও। রেগেমেগে হঠাৎ কিছু করায় যে সংকোচ বোধ করে নিখিলেশ, স্বভাবের সেই মৃদুতাকে অশ্রদ্ধা করতে শিখছে বিমলা। এ-মৃদুতাই যে এনে দেয় ভিতরকার জোর, আর তাও যে কোথাও সঞ্চারিত হতে পারে, বিমলার মতো আমাদেরও অনেকসময়ে সেটা বিশ্বাস করতে বাধে।

কিন্তু এই মৃদুতা মানে কি সবকিছুকে নির্বিচারে মেনে নেওয়া? তর্ক থেকে, যুক্তি থেকে, পিছিয়ে আসা? শান্ত ভঙ্গি নিয়েও *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে একাধিকবার আমরা তর্কে রত দেখেছি নিখিলেশকে, দেখেছি মৃদুতার সঙ্গে তেজের সংযোগ। আগে বিমলা কোনোদিন তার স্বামীকে বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শোনেনি, সন্দীপের সঙ্গে তার একদিনকার বাগ্‌বিনিময় শুনে মনে হলো 'আজ দেখলুম তার অস্ত্রচালনা'। অথচ, এর কয়েকটা মাত্র লাইন পরেই আছে: 'আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের ওপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদু স্বরে বললেন...' ইত্যাদি। বিমলা দেখতে পায়, আর সেইসঙ্গে আমরাও, যে, অস্ত্রচালনা আর মৃদুস্বর হাত-ধরাধরি করে চলতে পারে কীভাবে।

আমাদের যে মাস্টারমশাইয়ের কথা বলছিলাম, যাঁর শান্ত আত্মস্থ প্রত্যয় একটা আভা ছড়িয়ে দিত আমাদের মনে, তিনিও কিন্তু তর্ক করতেই শিখিয়েছিলেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের। ক্লাসের মধ্যে কোনো তর্কণীয় বিষয়ের উত্থাপন করে তিনি চাইতেন সমানে সমানে একটা কথা হোক। ব্যক্তিত্বের নমনীয়তা আর যুক্তির দৃঢ়তা একসঙ্গেই জড়ানো থাকত তাতে। তিনি শিক্ষক, এই

উচ্চপদবলে কখনো তিনি মাঝপথে থামিয়ে দেননি ছাত্রকে, তর্ক এগিয়ে যেতে দিয়েছেন অবাধে, যাতে নিজেরই বিচারবোধের জাগরণে যথার্থ একটা লক্ষ্যে এসে পৌঁছতে পারে তার্কিক।

এই তর্কসৌন্দর্যের আরেক বিকাশ আমরা দেখেছি আবু সয়ীদ আইয়ুবের লেখায়, কিংবা তাঁর সঙ্গে নানাজনের ব্যক্তিগত আলাপনে। কথায় বা লেখায় স্বরগ্রাম কখনো উঁচু হতো না তাঁর, বিপরীত পথকে বুঝতে চাইতেন এবং বোঝাতে চাইতেন প্রসারিত এক স্থৈর্য নিয়ে, লাবণ্যময় দৃঢ়তায় ভরপুর থাকত তাঁর কথা। প্রকাশ্য একটি বিতর্কের প্রসঙ্গে একপক্ষ যখন একবার চিঠিতে তাঁকে জানিয়েছিল কোনো-এক সাধারণ পাঠকের এই মন্তব্য যে দুজনের ওই তর্কে আইয়ুবই জিতেছেন, তার উত্তরে আইয়ুব লিখেছিলেন একটা স্মরণীয় কথা: 'আমাদের লেখাগুলিকে যাঁরা তর্কের হারজিতের খেলারূপে দেখেছেন তাঁরা ভুল করেছেন; তাঁদের কথা গণ্য করবার মতো নয়।'

কেন লিখেছিলেন কথাটা? কেননা যথার্থ তর্ক যাঁরা করেন তাঁরা তো কোনো-একটা বিষয়ের সত্যকে বুঝতে চান, বোঝাতে চান। সত্যানুসন্ধানটাই সেখানে বড়ো কথা। আর, দুজনে মিলে কথা বলতে বলতেই

পৌঁছনো যায়— পৌঁছনোর চেষ্টা করা যায়— সেই সত্যে। সে-সত্যে পৌঁছলে তার্কিকদের মধ্যে কোনো এক পক্ষ যে জিতে যায় তা নয়, জিতে যায় শুধু সত্য, সত্যের বোধ। তা যদি না ভাবি, তাহলে, তখন, বিষয়ের চেয়ে বিষয়ী হয়ে ওঠে বড়ো, সত্যের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে অহং। আমিকে রেখেও কীভাবে সেই আমিটিকে মুছে নিতে হয়, তার কিছু নজির আমরা দেখেছিলাম গোপীনাথবাবুর অধ্যাপনায়, আইয়ুবের বিচারণায়, চন্দ্রনাথবাবুর দীক্ষাদানে, নিখিলেশের আচরণে। অন্যদের কাছে এঁরা যা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন, অন্যদের যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা এঁদের আমিটাকে নয়, এঁদের অনুভূত সামগ্রিক এক সত্যকে। আমি দিয়ে প্রকাশের আর আমিকে মুছে নিয়ে প্রকাশের এই দুই ভঙ্গিতে বোধেরও ঘটে যায় অনেকখানি প্রভেদ।

৩

অনেকদিন আগে একজন চিকিৎসক এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, রোগী দেখবার জন্য। প্রাথমিক পরীক্ষা করে নেবার পর যখন তিনি বিধান লিখতে যাবেন, তখন বললেন আমাকে: 'এই ওষুধটা দিয়ে দুদিন আমরা দেখব। এতে যদি ফল না হয় তাহলে আমাদের

আরেকরকম করে ভাবতে হবে।’ তাঁর কথা শুনে অবাক হচ্ছিলাম। চিকিৎসা তো করবেন উনি, তাহলে ‘আমরা দেখব’ ‘আমাদের ভাবতে হবে’ এভাবে কেন বলছেন? বলার তো কথা ‘আমি দেখব’ ‘আমাকে অন্যরকম ভাবতে হবে’? সেটাই তো হতো সত্য কথা? সত্যি হতো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে ওই একটিমাত্র সত্যিকে মিথ্যে করে দিয়ে, ওই একটিমাত্র শব্দবদলে, ‘আমি’র থেকে ‘আমরা’য় পৌঁছে দিয়ে, ডাক্তারবাবু তাঁর রোগীটির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর পরিজনদেরও অনেকখানি শুশ্রূষা করে নিলেন। সেই মুহূর্তে আশ্বস্ত মন বলছিল, উনি আমাদের পারিবারিক লোক, আপনজন। রোগীর এই সমস্যাটাকে কেবল ওঁর জীবিকার দিক থেকে দেখছেন না, দেখছেন ব্যক্তিগতভাবে।

একটু আগে বললাম ‘সত্যিকে মিথ্যে করে দিয়ে’। কিন্তু মিথ্যেই কি ওটা? এটা নিশ্চয় শুধু পদ্ধতি হিসেবেই নয়, সত্য করেই তুলতে চেয়েছিলেন সেই ডাক্তারবাবু। অন্তত পরবর্তী কিছুদিনের আনাগোনায় আর উদ্‌বেগ-কাতরতায়, নিরাময়ের পর তাঁর অনাবিল আনন্দ-প্রকাশে, সত্যই হয়ে উঠেছিল সেটা। একটামাত্র ওই শব্দব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের পারস্পরিক ধারাবাহিক এক সখ্য।

'আমি'কে 'আমরা' করে তোলার ভিন্ন একটা বিবরণ পড়েছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখায়। কমলকুমার মজুমদার একটি উপন্যাস লিখছেন *কৃত্তিবাস* পত্রিকার জন্য, অল্পে অল্পে এগোচ্ছে সেটা, তাড়া দিচ্ছেন সুনীল। সেইরকম একটা সময়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে দাঁড়িয়ে কমলকুমার বলছেন: 'শোনো, এই-যে আমরা উপন্যাসটা লিখছি—', বাধা দিয়ে সুনীল বলেন: 'আমরা বলছেন কেন কমলদা, লিখছেন তো আপনি!' কমলকুমার বললেন: 'আঃ, থামো তো, আমি তো লিখছি না, ঠাকুর আমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন মাত্র। সেটা আমি না হয়ে তুমিও হতে পারতে, বা অন্য কেউ। আমরা সবাই মিলেই লিখছি।'

এই বলার মধ্যে যে নিছক একটা বিনয় আছে তা নয়, আছে একটা বিশ্বাস। বিশ্বাসটা এই যে, আমার আমিটা খুব বড়ো কথা নয়, ওটা একটা উপলক্ষ মাত্র। চারদিকের অভিজ্ঞতা একইসঙ্গে নানা ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে, কিন্তু তার প্রকাশ হচ্ছে হয়তো-বা একজন-দুজনের মধ্য দিয়ে। সেই প্রকাশের মুহূর্তে কেউ কখনো জোর দিয়েই বলতে পারেন যে এটা 'আমি' বলছি, বললে ভুল হয় না। আবার সেইটেকেই কেউ বলতে পারেন 'আমরা' বলছি, 'আমরা' ভাবছি। কমলকুমার একেবারে নিজের

উপন্যাস লেখার প্রসঙ্গে ওই বহুবচনটির ব্যবহার করেছেন বলে স্বভাবতই চমক লেগেছিল সুনীলের, কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে আমাদের লেখায় বা বলায় ও-রকম প্রয়োগ তো হামেশাই ঘটে। ঘটে না কি? ধরা যাক অমিয় চক্রবর্তীর *পালা-বদল* বইটির আলোচনায় বুদ্ধদেব বসু যখন লেখেন:

> ...এর 'রাত্রি' কবিতার 'হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না,/দেখি তুমি নেই'—আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'লিপিকা'র 'পরির পরিচয়'...

তখন নিশ্চয় সেটা একক বুদ্ধদেব বসুরই মনে পড়া, এটা বলা যায় না যে অনিবার্যভাবে সব পাঠকেরই ওখানে *লিপিকার* কথা মনে পড়বে। কিংবা,

> তিনটি যাত্রার কবিতা অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত আছে আমাদের মনে: বোদলেয়রের 'ভ্রমণ', র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী', ও রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'...

বা, এইরকম আরো আরো অনেক উত্তমপুরুষ বহুবচনের ব্যবহারে বোঝা যায় যে ওটা লেখকের নিজস্ব বক্তব্য, নিজস্ব বিবেচনা, একেবারেই তাঁর। বড়ো জোর তিনি চাইছেন যে এটা সকলের হয়ে উঠুক। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে উদ্ধৃত ওই বাক্যগুলির বহুবচনকে

একবচন করে দিলে কথাটা একই থাকে, শুধু মেজাজটা যায় পালটে। 'এই ধরনটি তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে যদি ফিরে আসতে থাকে তা'হলে আমরা বলতে পারবো যে বাংলা কবিতার জন্য নতুন একটি প্রদেশ তিনি জয় করলেন'— এই কথাটার 'আমরা'কে যদি 'আমি' করে দেওয়া যায়, সেই আমি-টা তবে বড়ো প্রত্যক্ষ হয়ে বড়ো স্পর্ধিতভাবে ধাক্কা দিতে পারে কোনো শ্রোতাকে বা পাঠককে, 'আমরা' বলে তাই হয়তো একটু নরম করে নিতে চাই তাকে।

অবশ্য, এমন 'আমরা'র ব্যবহারও সম্ভব, যেখানে 'আমি'টাই নেই। 'আমি'র বাইরে অন্য সবকিছু নিয়ে, বা প্রতিপক্ষ নিয়ে, 'আমরা'। চেকোস্লোভাকিয়ার কবি মিরোস্লাভ হোলুবের কবিতার প্রশস্তি করতে গিয়ে যদি কেউ লেখেন যে এ-কবিতা পাঠকদের ধাক্কা দেবে, কেননা: 'আমাদের কুসংস্কারগুলিকে আমরা বড়ো বেশি ভালোবাসি, সেগুলি কেউ ভাঙতে এলে সেই পরিত্রাতাকেই কুৎসিত ভাষায় গাল পাড়ি আমরা, অন্ধকার হতে জ্যোতিতে উত্তীর্ণ হতে আদৌ আমাদের আগ্রহ নেই', তখন বুঝতে পারি যে এই 'আমরা'র মধ্যে বক্তার 'আমি'টি নেই, কেননা তিনি তো আর কুৎসিত ভাষায় পরিত্রাতাকে গাল দিতে চাইছেন না, প্রশস্তি

করতেই তো চাইছেন তিনি। কিংবা, সমর সেন বিষয়ে শ্রদ্ধা জানাতে কেউ যদি লেখেন যে তাঁর কথা ভেবে আমাদের আর লাভ কী, 'আমরা কলেজে-কি-অফিসে যাবো, পান চিবোবো, একে ওকে খোশামোদ ক'রে বাড়তি দু-পয়সার ব্যবস্থা করবো, আখেরে সুবিধে হলে দু-তিনটে শৌখিন বক্তৃতা দেবো, রাত্রিতে আমাদের ঘুম খুব নিটোল হবে, প'ড়ে মরুক গে সমর সেন'— তখন, স্বভাবতই এই হীন আমরা-গুলির মধ্যে আমি নেই, কেননা সে-আমিই তো সমর সেনের কথা এত করে বলছেন।

ফিরে যাই আবার পুরোনো কথায়। 'আমি'কে 'আমরা'য় পালটে নেবার কথা বলছিলাম আগে। এমনও কখনো হতে পারে যে 'আমরা'ই পালটে গেল 'আমি'তে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি বইয়ের নাম অনেকেরই মনে পড়বে: *আমরা ও তাঁহারা*। গোটা বইটি দুইপক্ষের সংলাপ দিয়ে সাজানো। একপক্ষে তাঁহারা। আর অন্যপক্ষে? যে-বইয়ের নামের মধ্যে আছে 'আমরা', সে-বইয়ের পাঠের মধ্যে কিন্তু সবসময়েই 'আমি'। ভূমিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ বলে নিয়েছেন: '*আমরা ও তাঁহারা*-তে একদিকের বক্তা আমি, অন্যদিকের বক্তা

তাঁহারা।' নামে তাহলে 'আমরা' কেন? লেখকের কৈফিয়ত: 'নিজের মধ্যে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতের দোষগুলো লক্ষ্য করেছি বলেই একবচন ব্যবহার করেছি।' অর্থাৎ আমি এখানে আমরা-র প্রতিভূ।

সবসময়ে সেটা হয়ে উঠতে পেরেছে কি না, সে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। 'আমার মুখ দিয়ে ব্যক্ত মতামতগুলো ঠিক আমার নয়, আমার দলের' একথাটা তিনি মনে রাখতে বলেন পাঠকদের, কিন্তু সেই 'দল' অর্থাৎ 'তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত'দের সাধারণ গোত্র থেকে সরে এসে একেবারে ব্যক্তিগত ধূর্জটিপ্রসাদ হিসেবেই কথাগুলি তিনি উচ্চারণ করেন অনেকসময়ে। সে-প্রসঙ্গটা আপাতত বিবেচ্য নয়। আপাতত যেটা বলতে চাই তা এই যে, ধূর্জটিপ্রসাদের অভীষ্ট 'আমরা' এখানে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি তৈরি করে নিচ্ছে। শহুরে উচ্চশিক্ষিতের গণ্ডি। অন্যদিকে আছেন কারা? সাধারণ মানুষ। কিন্তু সেই সাধারণ মানুষ আবার নির্বাচিত। কেননা, ঘোষণা করেই বলেন ধূর্জটিপ্রসাদ: 'উচ্চশিক্ষিত এবং মূর্খের সঙ্গে কোন প্রকার কথোপকথন কি ভাবের বিনিময় সম্ভব নয়। সেইজন্যে শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবীকে এবং শহরের অন্য শ্রেণীর বন্ধুদেরকে প্রতীক হিসেবে নিতে

হয়েছে।' এই তাঁহারা-র প্রকল্পে তাহলে গ্রামীণ মানুষ নেই, মূর্খ মানুষ নেই, অন্ত্যজ মানুষ নেই।

সেটা তত বিস্ময়ের কথা নয়। বিস্ময়ের কথা এই ঘোষণা যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনো ভাবের বিনিময় বা কোনো কথোপকথনই সম্ভব নয় বলে ভাবছেন একজন সমাজতত্ত্ববিদ। তাহলে নির্দিষ্ট এই 'আমরা' ও 'তাঁহারা'-র বাইরেও যে বিরাট একটা ওরা-র অস্তিত্ব আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হবে কোথায়? বা, কীভাবে হবে সেটা?

আমরা যেখানে সত্যিই আমরা, আমরা যেখানে আমি, আমরা যেখানে আমিটাই নেই, আমিই যেখানে আমরা, আর আমরা যেখানে বৃত্তায়িত একটা গোষ্ঠী— এই নানারকমের প্রয়োগের কথা যে ভাবছি, তার সঙ্গে আমাদের জনসংযোগ বা সংযোগহীনতার একটা সম্পর্ক আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ 'আমরা' শব্দে যে-শ্রেণীটির কল্পনা করে নিয়েছেন, সে হলো একরকমের বিভাজন। নানাসময়ে নানাপ্রসঙ্গে, এই বিভাজনটাকে আমরা ভিন্ন নানা জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি। আমরা বিদ্বান ওরা অবিদ্বান, আমরা শহুরে ওরা গেঁয়ো, আমরা শাদা ওরা কালো, আমরা মুসলমান ওরা হিন্দু, আমরা মেয়ে ওরা পুরুষ, আমরা সি পি এম ওরা কংগ্রেস এবং এ-রকম

আরো আরো অনেক। কোনো কোনো বিবরণের জন্য এ-রকম বিভাজন দেখানোর দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু যেসব সময়ে এই সমস্তটাকে জড়িয়ে নিয়ে ভাবনা করবার কথা, তখন 'আমরা' শব্দের এমন বিভাজিত প্রয়োগ হয়তো স্থায়ী কোনো সংকট তৈরি করে তুলতে পারে, আমাদের বোঝায় অনেক ভুল ঘটে যেতে পারে। ধরা যাক, কোনো সরকার যখন 'আমরা' উচ্চারণে কোনো কথা বলেন, তখন সে-আমরা থেকে বিরোধী কোনো রাজনৈতিক পক্ষ বর্জিত থাকতে পারে বটে, কিন্তু তার অন্তর্গত করে নেবার কথা দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষকে। অর্থাৎ, বক্তাকে বুঝতে হবে যে তাঁর সেই 'আমরা'র পরিসর যত ছোটো হয়ে আসবে, তাঁর দেশও হয়ে উঠবে ততটাই খণ্ডিত। কথাটা এ নয় যে 'ওদের' 'আমরা' করে তুলতে হবে, বরং এই হবার কথা ছিল যে 'ওরা' 'আমরাই'। সেটা লক্ষ না করে, আমরা-ওরার যে বিভাজনটা দূর করবারই দায়িত্ব ছিল আমাদের, একটা শব্দব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেটাকে হয়তো-বা বাড়িয়েই চলেছি আমরা।

বলা যায়, শব্দব্যবহারটা স্বতন্ত্র কোনো সমস্যা নয়। শব্দব্যবহার মানসিকতারই বাইরের একটা প্রকাশ মাত্র। ঠিক। কিন্তু এও ঠিক যে মানসিকতা থেকে জাত শব্দটাই

আবার সেই মানসিকতাকে প্রভাবিত করতে থাকে। গণ্ডিবদ্ধ 'আমরা' বলতে বলতে আরো বেশি করে একটা দলীয় 'আমরা'র গণ্ডির মধ্যে ঢুকে পড়তে চায় মন, আত্মবিস্মৃত মন।

আর, বাচনের এই 'আমরা' যদি কখনো হয়ে ওঠে 'আমি'? প্রভুত্বের ওজনটা তখন আরো বেশি সামনে চলে আসে, আমাদের পেয়ে বসে। যে-কোনো একটা জায়গায় অল্পবিস্তর স্তরবিন্যাস থাকেই কর্মীদের মধ্যে। সেখানে প্রধান দায়িত্বে যিনি থাকেন, তিনি যদি কেবলই বলতে শুরু করেন 'আমার বিভাগ' 'আমার কর্মী' 'আমার লক্ষ্য', তাহলে তার মধ্য দিয়েই একটা বিপদের সূত্রপাত হয়। আমাদের যে ডাক্তারবাবুর কথা বলছিলাম আগে, তিনি একার করা কাজটা নিয়েই বলতেন 'আমাদের কাজ'। আর আমরা অনেকসময়েই সকলের করা কাজটাকে বলতে শুরু করি 'আমার কাজ'। ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক রাজনৈতিক স্তর পর্যন্ত এই 'আমি' তখন হয়ে ওঠে এক ঘোষণা-শব্দ, চিৎকার-শব্দ, যার মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে অবারণ একটা জোর দিয়ে বলবার প্রতাপভঙ্গি। আর সেই চোরাপথে এগিয়ে আসে ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদ আমাদের স্বভাবের একটা অনিয়ন্ত্রিত চিৎকার।

৪

একশো চব্বিশ বছর আগে *ভারতী* পত্রিকায় একটি লেখা ছাপা হয়েছিল, তার নাম 'চেঁচিয়ে বলা'। সে-লেখায় যে-সাধুভাষার ব্যবহার ছিল, তাকে চলিতের রূপে পালটে নিলে, মনে হতে পারে যেন একেবারে আজকের এই সময়টা নিয়ে, এর সমস্যাটা নিয়ে, কথা বলতে চাইছেন কেউ। সে-লেখার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে বেশ-কয়েকটি লাইন এখানে একবার শুনে নেব আমরা:

> ১. আজকাল সকলেই সকল বিষয়েই চেঁচিয়ে কথা কয়। আস্তে বলা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ...সেকরা গাড়ি যত না চলে, ততোধিক শব্দ করে; তাহার চাকা ঝনঝন করে, তাহার জানলা ঝরঝর করে, তাহার গাড়োয়ান গাল পাড়িতে থাকে, তাহার চাবুকের শব্দে অস্থির হইতে হয়। বঙ্গসমাজও আজকাল সেই চালে চলিতেছে, তাহার প্রত্যেক ইঞ্চি হইতে শব্দ বাহির হইতেছে।
>
> ২. কানটাই আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। দেখো-না, বাংলা খবরের কাগজগুলি কেবল শব্দের প্রভাবেই পাঠকদের কান দখল করিয়া বসিয়া আছে। কী যে বলিতেছে তাহা বড়ো একটা ভাবিয়া দেখে না,

> কেবল গলা খাটো না হইলেই হইল। একটা কথা উঠিলে হয়, অমনি বাংলা খবরের কাগজে মহা চেঁচামেচি পড়িয়া যায়। কথাটা হয়তো বোঝাই হয় নাই। ভালো করিয়া শোনাই হয় নাই, হয়তো সে বিষয়ে কিছু জানাই নাই— কিন্তু আবশ্যক কী? বিষয়টা যত কম বোঝা যায়, বোধ করি, ততই হো হো করিয়া চেঁচাইবার সুবিধা হয়।

লেখাটা, হয়তো না-বললেও চলে, রবীন্দ্রনাথের। লিখেছিলেন, যখন তাঁর বাইশ বছর বয়স। 'গলা খাটো না হইলেই হইল'— একথা অবশ্য এই সোয়াশো বছরে ভিন্ন একটা মাত্রা পেয়ে গেছে, কেননা খবরের কাগজের বাইরে এখন আরো আছে আকাশবাণী বা দূরদর্শন। সেখানে, আলংকারিক অর্থে নয়, বাস্তবতই গলা খাটো না করবার একটা যেন প্রতিযোগিতাই চলে। সভাস্থলের বক্তৃতা বিষয়ে 'চেঁচিয়ে বলা' প্রবন্ধে একটা কথা আছে এইরকম: 'বক্তা যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন, তখন সে এক অতি কষ্টকর দৃশ্য উপস্থিত হয়। গ্রহণী রোগীর ন্যায় তাঁহার হাতে পায়ে আক্ষেপ ধরিতে থাকে, গলার শির ফুলিয়া ওঠে, চোখ দুটো বাহির হইয়া আসিতে চায়।' কেবল সভাস্থলে নয়, এ-রকম দৃশ্য অনেকসময়েই আজকাল দেখতে হয় আমাদের, নানা জায়গাতেই।

দেখতে হয়, কেননা, শুধু এ-মাধ্যমে ও-মাধ্যমে নয়, দূরদর্শনের এ-খাতে ও-খাতেও ঘোর একটা প্রতিযোগিতা চলতে থাকে, স্কুপ বা এক্সক্লুসিভ বা বাইট-জাতীয় নেশার তাড়নায় উত্তেজনার ঝোঁকটা বেড়ে যায়, খবরদেনেওয়ালারা অথবা তার্কিকেরা ভাবতে থাকেন যে স্বরগ্রাম উঁচু থেকে উঁচুতে তুলতে পারলেই সত্য আরো বেশি করে জোর পাবে। কথাটা যাঁরা শুনছেন তাঁদের বোধ বা বিবেচনার উপর কোনো আস্থা থাকে না বলেই এমনটা ঘটে, না কি বক্তা নিজের কথার উপর ততটা ভরসা রাখতে পারেন না বলেই এটা করেন? হয়তো দুটোই সত্যি। 'প্রাণের সঙ্গে যখন কোনো কথা বলি, তখন যাহা বলি তাহারই একটা বল থাকে— যখন প্রাণে বাজে নাই অথচ মুখে বলিতে হইবে, তখন চেঁচাইয়া বলিতে হয়, বিস্তর বলিতে হয়।'— লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

চেঁচিয়ে বলার সঙ্গে এখানে যুক্ত হলো তবে বাড়িয়ে বলা, অত্যুক্তি। আর সেই বাড়িয়ে বলা সহজেই পৌঁছে যায় বানিয়ে বলায়, মিথ্যাচারে। বুঝিয়ে বলার চেয়ে বক্তার তখন দরকার হয় ঘোর লাগানো, নেশা ধরানো, হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌। 'এই তো হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌'— বলেছিল সন্দীপ। 'এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো

উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে? জয় হবে মোহের।' বলেছিল সে। অত্যুক্তি সইতে পারত না নিখিলেশ, আর সন্দীপের অস্ত্রই হলো অত্যুক্তি। তাই সন্দীপের প্রসঙ্গ এলেই উপন্যাসে আমাদের শুনতে হয় 'ঝড়ের দমকা হাওয়া'র কথা, 'বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চম্‌কানি'র কথা। তার দলবলের চিৎকারে 'আকাশটা যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে' পড়ে, তার স্বপ্ন 'জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর' দুলতে থাকা, যার 'চারিদিকে গর্জন আর ফেনা'। তর্কের জোর বোঝাতে মেঝের উপর লাথি মারে সে, 'কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চম্‌কে উপরে উঠে' পড়ে। ভিতরকার শক্তিতে যত দীনতা, বাইরে ততটাই বেড়ে ওঠে আস্ফালন, 'তাই এত ঠুকতে হয়, এত শব্দ করতে হয়'। সত্যকে সে চায় না, সত্যকে সে বানিয়ে তোলে।

বানিয়ে তোলার এই আস্ফালনে এই চিৎকারে চারপাশে গড়ে তোলা যায় নেশায়-পাওয়া দল, যেখানে আত্মব্যক্তিত্বের কোনো দরকার হয় না আর, দরকার হয় না নিজের প্রতি বা সত্যের প্রতি কোনো বিশ্বাসের বা অভিমুখিতার। তখন যে-সংযোগ ঘটে, সেটা কোনো বোধের সঙ্গে বোধের নয়, যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের। সে-রকম

সংযোগের— না কি অসংযোগের— কথা ভেবেই *চার অধ্যায়*-এর উত্তপ্ত অন্ত বলেছিল দিশেহারা এলাকে: 'আপন শক্তির পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল।'

শুধু *চার অধ্যায়* বা *ঘরে-বাইরে*র ঘটনাকালে নয়, যে-কোনো রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের বড়ো বড়ো মুহূর্তে এই কথাগুলির সত্যতা আমরা বারে বারেই দেখতে পাই। দেখতে পাই যে, পারস্পরিক সংযোগের কোনো সুঠাম পথে আমাদের সন্ধান থাকে কম, দ্রুত সিদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ব্যক্তির বা দলীয়তার জোর খাটানোটাই হয়ে ওঠে বড়ো। জোর যে শুধু আস্ফালনে নয়, নেশাটাই যে ফলপ্রদ শক্তি নয়, সত্যের সঙ্গে খাটে না কোনো জোর-জবরদস্তি,— নিখিলেশের মতো সেইসব আত্মস্থ বিশ্বাসে আর ভরসা রাখতে পারি না আমরা।

বলছি না যে এ কেবল আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক সমস্যা। *ঘরে-বাইরে* যেমন একইসঙ্গে রাজনৈতিক আর গৃহনৈতিক, আমাদের সমস্ত সমস্যাই

প্রায় সেইরকম, একাধিক তলে একইসঙ্গে তার চলাচল। ঘরে কিংবা বাইরে, কাজে কিংবা খেলায়, একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক রচনায় এই প্রভুত্ব বা জোরটাই আমাদের চালাতে থাকে পদে পদে, সংযোগের অর্থ তখন দাঁড়ায় শুধু প্রচ্ছন্ন সংযোগহীনতা। হাতের থেকে একটু দূরেই থেকে যায় হাত। মাঝখানে জেগে থাকে শুধু আস্ফালনের কথা, অহংগণ্ডির কথা, মহানগরের ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে-থাকা অলস উৎক্ষিপ্ত নিষ্ফল বিবর্ণ কিছু কথা। মনে পড়ে, 'আর্তুরো উই'তে ব্রেখ্‌ট্‌ একবার লিখেছিলেন: 'কথা বলবার বদলে যদি শুধু একটু কাজ করতে পারতাম আমরা!'

৫

ঘরে-বাইরের নিখিলেশ তর্ক করেছে অনেকসময়ে, সন্দীপের সঙ্গে বিমলার সঙ্গে, কিন্তু অনেক অনেক বলবার-মতো মুহূর্তে সে বলেওনি কোনো কথা। আস্তে আস্তে তার উঠে চলে যাওয়ার কিংবা আস্তে আস্তে অল্প কয়েকটা কথা বলার ছবি ধরা আছে বিমলার মনে। একবার যেমন: 'মনে হল আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিনি বললেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।' এই চলে-যাওয়াও কিছু বলে না কি? দীর্ঘ তপ্ত

বাগ্মিতায় সন্দীপ যখন দেশের মেয়েদের অন্যায় শক্তির স্তুতি করছে, আবেগভরে কবিতা শোনাচ্ছে, গর্জে উঠে বলছে 'আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও', নিখিলেশ তখন তার গায়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলছে: 'সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু এসেছেন।' সবকিছুর ওপর নম্রতার একটা প্রলেপ এসে পড়ল।

এই ধীরতার কোনো সুদূর ফলও কি নেই? এত-যে উদ্‌ভ্রান্ত অবুঝ বিমলা, সেও কিন্তু কখনো শরীরের নীরব ভাষায় দেখতে পায়: 'আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল।' শব্দহীনতা কিছুই যে তাকে বলেনি তা নয়। সে দেখতে পায় কীভাবে সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে নিখিলেশকে 'যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর একটা-কিছুকে দেখতে পেতেন।'

একাধিকবার এ-উপন্যাসে বলা আছে যে 'নিখিল চুপ করে রইল'। নীরবতারও একটা ভাষা আছে। সে-ভাষা পড়তে অনেকসময়ে ভুলে যাই আমরা। শুধু যে পড়তে ভুলি তা নয়, তার ব্যবহারও হয়তো ভুলে যাই জীবনে, ভুলে যাই যে অনেকসময়ে নীরবতা একটা সামর্থ্য। ভাষার সংযোগের সঙ্গে নীরবতার সংযোগ মিলে গিয়ে

যৌথভাবে গড়ে ওঠে একটা সংযোগের ভাষা। জীবনব্যবহারে সেই ভাষাটাকে বারেবারেই হারিয়ে ফেলি আমরা। আর তখনই বেড়ে ওঠে চিৎকার, তখনই বেড়ে ওঠে আমি, তখনই বেড়ে ওঠে পরস্পরের মধ্যে সেতুহীন এক দূরত্ব।

পশ্চিম জগতের একটা প্রথা আছে, সামান্যতম যে-কোনো প্রাপ্তিতে বলতে হয় 'ধন্যবাদ', না-বলাটা সেখানে অপরাধ। অবশ্য এখন আর 'পশ্চিমজগতে' বলবার মানে নেই, আমাদেরও এটা কৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই কথাটা কিন্তু এমনভাবেও উচ্চারণ করতে পারি আমরা— করে থাকি অনেকসময়ে— যাতে শব্দটা থাকে, ধন্যতাটা থাকে না কোথাও। উলটোপক্ষে, কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়াও, আমাদের সেই কৃতজ্ঞ মনোভাবটা প্রকাশ করতে পারি আমরা, আমাদের মুখের রেখায়, চোখের চাওয়ায়, আমাদের সামগ্রিক দৈহিক আভায়। রবীন্দ্রনাথের *কণিকায়* দুটি লাইন আছে এ-রকম:

> দয়া বলে, কে গো তুমি মুখে নাই কথা?
> অশ্রুভরা আঁখি বলে, আমি কৃতজ্ঞতা।

অশ্রুভরা আঁখিই কেবল নয়, শব্দহীন শরীর নানামুহূর্তে খুঁজে নেয় তার নানারকমের ভাষা। উচ্চারিত শব্দের

বাইরেও তখন তৈরি হয়ে ওঠে ভিন্নরকম সংযোগের বোধ। আবার, শব্দেরও মধ্যে মেলানো থাকতে পারে অনেক সেই অনুচ্চারণ।

'কানটাই আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে'— এই আক্ষেপের কথাটা ছিল 'চেঁচিয়ে বলা' প্রবন্ধে। আর, তার অনেকদিন পরে, এর একেবারে উলটোপ্রান্তে, *ফাল্গুনী* নাটকে, অন্ধ বাউলের সঙ্গে নবযৌবনের দলবলের একটা সংলাপ চলছিল এইরকম:

> কী হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে তো?
> ঠিক নিয়ে যাব।
> কেমন ক'রে।
> আমি-যে পায়ের শব্দ শুনতে পাই।
> কান তো আমাদেরও আছে, কিন্তু—
> আমি যে সব-দিয়ে শুনি— শুধু কান দিয়ে না।

এই সব-দিয়ে শোনার জন্য কখনো কখনো প্রস্তুত হতে হয় আমাদের। সে যে কেবল শিল্পের আস্বাদনে তা নয়, সে যে কেবল প্রণয়ের মুহূর্তে তা নয়, সে আমাদের নিছক দৈনন্দিনেও, সে আমাদের সমাজনৈতিক চর্চাতেও। সংযোগের অভিপ্রায়ে তৈরি করে তোলা আমাদের সমস্ত ভাষারই মধ্যে আমরা তাই ছড়িয়ে রাখতে চাই একটা নীরবতার পরিসর, সমস্ত চিৎকারের

বাইরে, সমস্ত আমিত্বের বাইরে। আর সেইভাবে, আমাদের যে-কোনো পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই, এই এক সব-দিয়ে শোনার জন্য নিজেকে উন্মুখ রাখতে চাই আমরা। তখন, শুধু বাণী নয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় অন্য কোনো স্পর্শের জন্য, বলতে ইচ্ছে হয়: হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো।

—

মাসদেড়েক আগে, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের প্রযোজনায়, একটি অভিনয় চলছিল কার্জন পার্কে। পড়তি বিকেলে, খোলা জায়গায়, ছোটো একটি বৃত্ত তৈরি করে নিয়ে সেখানে *রক্তকরবীর* অভিনয় করছিলেন কয়েকজন মানুষ, কেউ যাঁরা চোখে দেখতে পান না। দর্শক ছিলেন অল্প কয়েকজন। পূর্ণ অন্ধদের সেই সুঠাম অভিনয়শেষে দর্শকেরা যখন উচ্ছ্বাস জানাচ্ছেন, আশ্চর্য একটি দৃশ্যের জন্ম হলো তখন। সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে কুশীলবেরা সবাই তাঁদের খোলা দুহাত বাড়িয়ে রেখেছেন প্রার্থীর মতো। কী চান তাঁরা? কিছু কি চান? তাঁদের মধ্যে একজন বললেন: 'আপনারা সবাই এসেছেন, কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা যদি আমাদের সকলের হাতের ওপর একটু

হাত ছুঁয়ে যান, আপনাদের ভালো-লাগাটা আমাদের মধ্যে পৌঁছবে, আমাদের ভালো লাগবে।' দর্শকেরা একে একে সকলের হাতে হাত রাখলেন, কারো কারো চোখে এল জল।

আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।

আমরা অনেকসময়েই সকলের করা কাজটাকে
বলতে শুরু করি 'আমার কাজ'।
ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক রাজনৈতিক
স্তর পর্যন্ত এই 'আমি' তখন হয়ে ওঠে
এক ঘোষণা-শব্দ, চিৎকার-শব্দ,
যার মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে অবারণ
একটা জোর দিয়ে বলবার প্রতাপভঙ্গি।
আর সেই চোরাপথে এগিয়ে আসে ফ্যাসিবাদ
ফ্যাসিবাদ আমাদের স্বভাবের
একটা অনিয়ন্ত্রিত চিৎকার।

প্রচ্ছদচিত্র কৃষ্ণেন্দু চাকী